International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-III, May 2022, Page No. 29-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i3.2022.29-39

স্বাধীনোত্তর পর্ব ও বাঁকুড়ায় কৃষির বিবর্তন

সাথী মন্ডল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Agricultural traces have been found in Bankura since the Neolithic age. Later the diversity of agriculture was also seen in Maurya, Gupta, Sultani and Mughal period in Bankura. The diversity of the land system has been seen in the Malla era, which was also prevalent in the British period. But in spite of so much diversity, the condition of the farmers has not changed much. As a result, agricultural policies and plans, which adopted in the post-independence period of the country, greatly affected agriculture and farmers. To improve the irrigation system, dams and ponds were renovated along with the river embankment plan. Some bank was set up in Bankura for land development. Loans were given from this bank for digging ponds and convert fellow land into arable land. Attempts were made to improve the credit societies for the betterment of agriculture. However, more importance was given to irrigation and for this purpose irrigation cooperative society was set up. The Kangsavati Dam was constructed in 1964 and as a result, huge areas come under irrigation. The effect of the Five Year plan was to bring about some significant changes in the agriculture sector in the district. For example, intensive agricultural projects were taken up, agricultural farms were formed etc. As a result of these things, there was a radical change in production. Since 1977, rural development programs have been adopted through panchayats. Important land renovation works such as 'Patta', 'Operation Barga' etc. were carried out. As a result, many landless people benefited tremendously. This article seeks to highlight the various aspects of agricultural development in Bankura through a comprehensive discussion. This article discusses various aspects of increasing production as a result of agricultural development, crop diversification, improving the living standards of farmers and rural development.

Keyword : The agriculture of Bankura, Land reform, Irrigation system, Crop diversification, Operation Barga, Three tier panchayat system, Rural development.

মানব সমাজের বিকাশ ও কৃষির বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। মানুষ একসময় খাদ্য সংগ্রাহক থাকলেও নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বুদ্ধি বলে খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠেছিল । কৃষির সেই প্রাচীন ধারা সমগ্র বিশ্বে আজও প্রবহমান। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আদি জনবসতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঁকুড়াও সেই ধরনের একটি স্থান যেখানে পুরাপ্রস্তর যুগ থেকেই মানব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থারও প্রমান পাওয়া যায়। প্রাচীন সেই কৃষি ব্যবস্থায় সময় ভেদে কখনো ঘটেছে উন্নতি আবার কখনো ঘটেছে অবনতি। আর এর ফলে কৃষকের জীবনেও উত্থান পতন ঘটেছে। কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত থেকে উন্নততর করার জন্য মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করেছে এবং করে চলেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা প্রযুক্তি, উন্নত মানের বীজ। যার প্রয়োগে বাঁকুড়ার জমি একফসলি থেকে দো-ফসলী, তিন - ফসলী হয়ে উঠেছে। বাঁকুড়ার রুক্ষ - শুষ্ক-ডাঙ্গা জমিতে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাঁকুড়াতে মোট আয়ের ৭০ শতাংশই আসে কৃষি থেকে। [১] কৃষিকে কেন্দ্র করেই বাঁকুড়ার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়, যা বাঁকুড়াকে কৃষি প্রধান জেলা হিসেবেই প্রমান করে। সুপ্রাচীন বাঁকুড়ার কৃষির ধারা একটি আকর্ষণীয় বিষয়।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে কৃষির যে দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলি হল ----

১. ঔপনিবেশিক বাঁকুড়াতে কৃষির ধারা পর্যালোচনা করা।

২. স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়াতে কৃষির অগ্রগতির দিকগুলি পর্যালোচনা করা।

৩. কৃষির উন্নতি কৃষকের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল করেছিল তা আলোচনা করা।

বাঁকুড়া কৃষি প্রধান জেলা হওয়ায় এখানে কৃষির গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন লোকগীতি, ছড়া, গান, ধাঁধা, প্রবাদ- প্রবচনের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থেও বাঁকুড়ার কৃষির উল্লেখ রয়েছে। যেমন --- মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্য, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্য ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বাঁকুড়ার কৃষির উল্লেখ আছে। প্রাচীন কাল থেকেই কৃষি সম্পর্কিত ছড়া, গান, ধাঁধার পাশাপাশি উৎসবও প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে ব্যস্ততার কারণে কৃষি সংক্রান্ত উৎসবগুলি লোপ পেলেও কিছু কিছু স্থানে এগুলির প্রচলন আজও আছে। তাই আজও বাঁকুড়াতে কৃষির দেবী হিসেবে ভাদু, টুসু কৃষির উন্নতির জন্য পূজিত হন। টুসু গানের মধ্যে কৃষি, কৃষক সমাজ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কথা প্রকাশ পায়। এছাড়া গান ছড়ার মাধ্যমেও বাঁকুড়ার কৃষির সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। যেমন -- বিনয় ঘোষের '*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে পোখন্নার সমৃদ্ধি নিয়ে একটি লোকগানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে --- 'চারমাস বর্ষা পোখরনা যায় / পোখরনা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই / ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে / বড় মরাইয়ে পা দিয়ে / রাই এসো গো ঝলমলিয়ে'। [২] আবার ধানের ফলন ভালো পাওয়ার আশায় কৃষক বীজপূণ্যার দিন বীজ বপন করে। তাদের বিশ্বাস --- 'ধান বীজ করি বপন / বীজপূণ্যার দিনে / গোলা ভরে ধান পাব / কার্ত্তিক অঘ্রাণে'। [৩] শিল্প বিশেষত ছোট শিল্পও বাঁকুড়ার মানুষের উপর তেমন ফলপ্রসূ না হওয়ায় কৃষিই বাঁকুড়ার মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

কৃষির বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বাঁকুড়ার ভৌগোলিক অবস্থান জানা প্রয়োজন। কারণ কৃষি ও সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভৌগোলিক দিক থেকে বাঁকুড়ার অবস্থান ২২°৩৮ ’থেকে ২৩°৩৮’উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৩৬’থেকে ৮৭°৪৬’পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার মোট আয়তন ৬৮৮২ বর্গকিমি। ২০১১ সালের জনগননার রিপোর্ট অনুযায়ী আয়তনের দিক থেকে বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বৃহত্তম জেলা। বাঁকুড়ার পূর্ব দিকে হুগলি জেলা, পশ্চিম দিকে পুরুলিয়া জেলা, উত্তরে বর্ধমান জেলা ও দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। এই জেলায় তিনটি মহকুমা ও ২২ টি ব্লক রয়েছে। বাঁকুড়া তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভূপ্রকৃতির তারতম্য অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় --- ১. পশ্চিমের উচ্চভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চল ২. মধ্যভাগের অসমতল অঞ্চল ও ৩. পূর্বের পলিগঠিত সমভূমি। বাঁকুড়ার অধিকাংশ অঞ্চল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। তবে পূর্ব দিকে পলিগঠিত সমভূমি দেখা যায়। বেশিরভাগ অঞ্চলের মৃত্তিকা কাঁকুরে, অনুর্বর হলেও এখানকার কৃষক নিজের শ্রমের দ্বারা ঐ মাটিকে চাষযোগ্য করে বছরের পর বছর ফসল ফলিয়ে চলেছে। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভব ও ব্যবহার। সেইসব নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বাঁকুড়াতে কৃষির অগ্রগতি ঘটে চলেছে।

বাঁকুড়ার কৃষি যথেষ্ট প্রাচীন কারণ নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই বাঁকুড়াতে কৃষির নিদর্শন পাওয়া যায় । বাঁকুড়াতে তাম্রাশ্মীয় যুগে গ্রাম ভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ডিহর, তুলসীপুর, পোখরনা, কুমারডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে। [৪] গ্রাম বসতির নিদর্শন কৃষিকাজ প্রচলিত থাকার প্রমাণ দেয়। গুপ্ত যুগে বাঁকুড়ার ছাতনা অঞ্চলে শুশুনিয়া লিপিতে পুষ্করনের অধিপতি চন্দ্রবর্মণ কর্তৃক দেবতা চক্রস্বামীকে ধোসো গ্রাম দানের বিষয়টি ভূমি ব্যবস্থার নতুন আঙ্গিকের পরিচয় দেয়। [৫] অতঃপর মল্ল যুগে কৃষিতে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এইসময় সেবার বিনিময়ে ভূমিদান প্রচলিত থাকায় ভূমি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আসে। ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজ সরকার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেও মল্ল যুগের বেশ কিছু ভূমি ব্যবস্থা প্রচলিত রাখতে বাধ্য হয়। তবে এই সময়ই কৃষকদের জীবন রাজস্বের চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই কারনেই দেশকে ব্রিটিশদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বস্তরের মানুষদের মতো কৃষকরাও সমান তালে সামিল হয়ে ১৯৪৭ সালে দেশকে স্বাধীন করেছিল। তাদের আশা ছিল সর্বশ্রেণির মতো তারাও উন্নতির মুখ দেখবে ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। এই প্রবন্ধে স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়ার কৃষি ও কৃষকের অবস্থার দিকগুলি তুলে ধরা হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল জমিদারি উচ্ছেদ, ভূমি সংস্কার আইন প্রভৃতি। যা দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সব ধরনের কৃষকের জীবনে কতখানি পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা যথেষ্ট সংশয়পূর্ণ। কৃষকের সুবিধার জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। বিভিন্ন জেলায় সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, ঋণ দানের সুবিধা সহ নানা দিকে উন্নতির প্রচেষ্টা সরকার ক্রমাগত করেছে । বাঁকুড়া খরাপ্রবন এলাকা হওয়ার জন্য বাঁকুড়াতে

সেচের উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নদী বাঁধ পরিকল্পনার সাথে সাথে বাঁধ, পুকুরও সংস্কার করা হয়েছিল। নীচের সারনী থেকে বিভিন্ন থানায় সংস্কার হওয়া পুকুর বাঁধের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়। [৬]

সময়কাল (১৯৪৬ - ৪৭)

থানার নাম	সংস্কার হওয়া পুকুরের সংখ্যা
ছাতনা	১৩
বাঁকুড়া	১৮
মেজিয়া	১
রানীবাঁধ	১
শালতোড়া	৬
তালডাংরা	৮
ওন্দা	১৬
সিমলাপাল	৪
রাইপুর	১৮
খাতড়া	৪
ইন্দপুর	১৯
জি. ঘাটি	১৬
বড়জোড়া	২২
বিষ্ণুপুর	৮
সোনামুখী	৬
জয়পুর	৬
ইন্দাস	০
কোতুলপুর	৩
পাত্রসায়ের	৪

সেচের উন্নতি কল্পে ভারতীয় গনপরিষদের একটি আইন বলে (Act no xiv of 1948) ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। [৭] যার ফলে বাঁকুড়াও সেচের আওতাভুক্ত হয়। স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে 'অধিক ফসল ফলাও' এর কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালেও সেচের জন্য বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আর এরই ভিত্তিতে সেচমন্ত্রী শ্রী ভূপতি মজুমদার শুভঙ্কর দাঁড়ার সংস্কারের উদ্যোগ নেন। এই

দাঁড়া থেকে সবসময় সেচের জন্য যাতে জল পাওয়া যায়, তার জন্য ১৯৫০ সালে কাঁটাবাঁধ মৌজায় ১৩ কোটি ঘনফুটের একটি জলাধার নির্মিত হয়। [৮] শালী নদীতে সারাবছর জল থাকলেও ক্রমশ নীচের দিকে বয়ে চলে যাওয়ার কারণে সেচের কাজে তা খুব কম লাগত। তাই শীতকালীন ফসল চাষের জন্য এই নদীর জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে এই নদীর উপর বাঁধ তৈরি করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। [৯]

পুকুর খনন, সংস্কার প্রভৃতি কাজের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। আর তাই এই কাজের জন্য বিশেষত জমি উন্নয়নের জন্য বাঁকুড়াতে ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়, যেটির রেজিস্ট্রি হয় ১৯৫৪ সালের ১লা জুন। উচ্চ বা পতিত জমিকে চাষযোগ্য জমিতে পরিনত করা, পুকুর সংস্কার, পুকুর খননের জন্য এই ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদের টাকা দেওয়া হত। পরবর্তীকালে কৃষিকাজের জন্য পাম্প সেট, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতিও দেওয়া হতে থাকে।[১০] এছাড়াও কৃষকদের সুবিধার জন্য কৃষি ঋণদান সমিতি গুলিকেও আরো উন্নত করার চেষ্টা করা হয়। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই কৃষি ঋণদান সমিতি (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ) গড়ে উঠলেও স্বাধীনতার পর থেকে এগুলির সংখ্যা ও ক্ষমতা উভয়েই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে এই ধরনের সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৬৪ টি। [১১]

তবে বাঁকুড়ার ভূমি রুক্ষ - শুষ্ক হওয়ায় কৃষিতে জলের সমস্যা মেটানোর জন্য সেচের উপরই বরাবরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই স্বাধীনতার পর আরও অনেক সেচ প্রকল্প গৃহীত হয়। যেমন --- রুকনি, কুলাই, বাঁশ, চামকেরা, ভালুকজোড়া, বিরাই, ভোরা খাল প্রকল্প গৃহীত হয়। [১২] সেচের উন্নতির জন্য জলসেচ সমবায় সমিতিগুলির উন্নতির চেষ্টা করা হয়। আর তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৫ সালে জলসেচ সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭৮ টিতে (১৯২০ সালে এই সমবায় সমিতি গঠন শুরু হয়েছিল)। [১৩] পুকুর খনন, খাল প্রকল্পের জন্য ধীরে ধীরে সেচসেবিত অঞ্চলও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৬ - ৬০ সালে পুকুর, কুয়ো, খাল থেকে ৩২৯৪০০ একর সেচের অধীনে আসায় কর্ষিত জমির প্রায় ২৬% সেচসেবিত বলে চিহ্নিত করা হয়। [১৪] এগুলি ছাড়াও আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলসেচনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যদিও সব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়নি, তবুও কৃষিকাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। ১৯৫৫ - ৬৩ সাল পর্যন্ত কতগুলি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেগুলোর মধ্যে কতগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল তা নীচের সারনী থেকেই জানা যায়। [১৫]

প্রকল্প	১৯৫৫ - ৫৬	১৯৬১ - ৬২	১৯৬২ - ৬৩
গ্রহণ করা হয়েছিল	৫১	৩২	৮৬
সমাধা হয়েছিল	২৯	১৫	৫৬

এছাড়াও ১৯৬০ - ৬৩ সালের মধ্যে মোট ৯ টি গভীর নলকূপও খনন করা হয়েছিল। [১৬] তবে বাঁকুড়া জেলায় সেচের জন্য সবথেকে বড় কাজ যেটি হয়েছিল তা হল ১৯৬৪ সালে। এই সময় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফসল রূপে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ও এশিয়ার সর্ববৃহৎ মাটির বাঁধ 'কংসাবতী জলাধার'নির্মিত হয়। [১৭] এর ফলে বিস্তৃত অঞ্চল সেচের অধীনে আসে।

শুধুমাত্র সেচ ব্যবস্থাতেই নয়, বাঁকুড়ার কৃষি পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন এসেছিল। স্বাধীনতার পর মূলত খাদ্য সংকট মেটানোর জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছিল 'সবুজ বিপ্লব'। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ঢেউ অন্যান্য স্থানের মতো বাঁকুড়াতেও এসে পড়েছিল। জাতীয় পরিকল্পনার প্রভাবে নতুন প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করে বাঁকুড়া কৃষিতে অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। জাতীয় পরিকল্পনার ফলে এই জেলায় কৃষি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল। যেমন - ১৯৬০ - ৬১ সালে এই জেলায় সেচের জন্য পাম্প এছাড়া সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, ১৯৬৪ - ৬৫ সালে নিবিড় কৃষি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, ১৬ টি বীজ খামার, শুশুনিয়াতে এবং বাঁকুড়া শহরে কৃষি ফার্ম গড়ে তোলা হয়, বিভিন্ন বীমা ও কৃষকদের কৃষি ঋণ দানেরও ব্যবস্থা করা হয়। [১৮] এইভাবে নানাদিকে বিশেষত সেচের উন্নতি ঘটতে থাকে ও তার সাথে ধীরে ধীরে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীচের সারনী থেকে সেচের বিভিন্ন উৎস ও সেগুলির পরিমাণ সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়। [১৯]

Area Irrigated Through Different Agencies in Bankura District (in acres)

Year	Government canals	Private canals	Tanks	Wells	Other sources	Total
1960 - 61	40,300	53,400	1,86,000	2,700	9,400	2, 91, 800
1961 - 62	50,800	63,700	1,82,500	2,800	9,500	3, 09, 300
1962 - 63	56,500	53,500	1,78,800	3,000	9,000	3,00,800

সেচের উৎস বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁকুড়াতে সেচসেবিত এলাকাও বৃদ্ধি পায়, ফলে এখানে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। নীচের সারনী থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। [২০]

Area under Irrigated Crops in Bankura District (in acres)

Name of Crop	1960 - 61	1961 - 62	1962 - 63
Rice	2,71,200	2,86,100	2,81,400
Wheat	6,800	10,200	6,000
Barley	700	700	600
Jowar	100	100	100
Maize	2,800	2,200	2, 000
Other cereals and pulses	3,100	3,200	3,300
Sugarcane	3,500	4,000	4,000
Other food crops including fruits and vegetables	6,200	6,200	6,300
Total	2,94,400	3,12,700	3,03,700

সেচের উন্নতির কারনেই **১৯৬৪ - ৬৫** সালে নিবিড় কৃষি প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। আর এর ফলেই একফসলী জমি হয়ে উঠেছিল দু - তিন ফসলী। এইভাবেই বাঁকুড়াতে কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে বাঁকুড়াতে শুধুমাত্র সেচ বা উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেই নজর দেওয়া হয়েছিল তাই নয়, ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা জমি জরিপের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। **১৯৭২** সাল থেকে ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলায় স্বত্ত্বলিপি প্রস্তুতের জন্য জরিপের কাজ শুরু হয়। আর সেই পাঁচটি জেলার মধ্যে বাঁকুড়াও ছিল। **১৯৭৪** সাল থেকে অন্যান্য জেলার মতো (পুরুলিয়া ছাড়া) বাঁকুড়াতেও জরিপের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল। [২১] তবে এই সব আইনের সুফল সাধারণ কৃষক পেলেও তা ছিল কম। ধনী কৃষকরাই এর বেশি সুবিধা ভোগ করেছিল। এইরকম দৃষ্টান্তের উদাহরণ এই জেলায় পাওয়া যায়। যেমন ---- **১৯৭১ - ৭২** সালে ইন্দ্র লোহারের মামলা, **১৯৭৩** সালে গঙ্গাজলঘাটির আনন্দপুর গ্রামের মতিলাল ঘোষের মামলা, **১৯৭৩** সালে বিষ্ণুপুরের হিনজুরী গ্রামে পঞ্চানন রায়ের মামলা। এরা সকলেই ছিল বর্গাদার কিন্তু ভূমি সংস্কার আইনের সুফল তারা পায়নি, বরং মামলা মোকদ্দমা লড়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। [২২] এছাড়াও আরো নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গে **১৯৭৭** সালে তৈরি হয়েছিল নতুন পরিস্থিতি । নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার পরেই নানাভাবে কৃষক সমাজ ও কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। যার ফলে কৃষক সমাজে পরিবর্তন নেমে আসে। **১৯৭৮** সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার পর থেকে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে এবং পঞ্চায়েত ক্রমাগত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের উন্নতি বিধানের চেষ্টা চালিয়ে যায়। গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীগুলির মধ্যে ছিল --- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (F.F.W), সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (I.R. D. P), জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি (N.R. E. P), গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি (R. L. E. G. P), জওহর রোজগার যোজনা (J. R. Y) প্রভৃতি । [২৩] এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে বাঁকুড়াতে ব্যাপকভাবে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। **১৯৭৮ - ৭৯** সালে বন্যায় যাতে মানুষের খাদ্যাভাব না ঘটে তার জন্যই 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য'কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর ফলে যেমন মানুষকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি তেমনি অন্যান্য প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পের মাধ্যমেও বাঁকুড়াতে নতুন নতুন জল নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। জোড়বাঁধ, স্যালো, ডিপ টিউবওয়েল সহ ছোট মাঝারি সেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছিল। যার ফলে বহু অঞ্চল সেচের আওতাভুক্ত হয়েছিল। এছাড়া ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা উঁচু নিচু জমিকে সমতল করে চাষযোগ্য করার কাজও করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেচের বিভিন্ন উৎসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নীচের সারনী থেকেই জানা যায়। [২৪]

সময়কাল ১৯৮৮

উৎস	সংখ্যা
জল উত্তোলন প্রকল্প LRI	১৭৯ টি
গভীর নলকূপ	৫৫ টি
অগভীর নলকূপ	১৩,০০২টি
সেচকুয়া	৮,৬৮৪ টি
পুকুর	২৬,৪১২টি
প্রস্রবণ	৪৭৯ টি

এইসব উৎস থেকে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ছিল ২,৩৫,৭৩৫ হেক্টর। [২৫] সেচের উন্নতি ছাড়াও কৃষকদের অন্যান্য চাহিদা মেটানোর দিকেও নজর দেওয়া হয়। তাই কৃষকের উন্নতির জন্য National Development Council এর সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষকের যাবতীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ব্লকে সেবা সমবায় সমিতি গঠনের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৯ সালে ৩০ শে জুন তারিখে বাঁকুড়ায় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা হয় ৪১১ টি। [২৬] এই সমবায় সমিতি কর্জ্জ দাদনের সাথে সাথে সার, বীজ, কীটনাশক, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থাও করে। ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হওয়ার সাথে সাথে বাঁকুড়ার গ্রামীণ আর্থ - সামাজিক ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। সেচের উন্নতি ও কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের ফলে কৃষি উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। নীচের সারনী থেকে ১৯৯০ - ৯১ সালের কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান জানা যায়। [২৭]

ফসলের নাম	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
ধান	৮,৪৩,৯৪৮
গম	১২,৩২২
আলু	৫,১০,৫০০
ডাল	১,৩১১
সরিষা	৩,০০০
সবজি	৫,৬০,০০০

ভূমি সংস্কারের কাজের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এইসময় ভূমি সংস্কার মূলক নানা কাজ হয়েছিল। ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা 'পাট্টা' এবং'চাষ ও বসবাসের জন্য ভূমিদান' প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ কারিগরদের পাঁচ কাঠা পর্যন্ত বিনামূল্যে জমিদান, শহরের গরিব মানুষদের জন্য কুড়ি বছরের উপর সরকারি জমিতে বসবাসকারীদের এক টাকায় ৯৯ বছরের লিজ দেওয়া

প্রভৃতি কাজও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছিল। [২৮] তবে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার মূলক কাজের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল 'অপারেশন বর্গা'। এই কাজের মাধ্যমে গরিব বর্গাদাররা ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছিল। এছাড়া পাট্টা প্রদানের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকেরা নিজস্ব জমি পেয়েছিল। ১৯৯১ সালের সেনসাস অনুযায়ী বাঁকুড়াতে পাট্টা প্রাপকদের সংখ্যা ছিল ১,০০৭৭৪ জন এবং পাট্টা প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ১৫,৫২২. ৪৬ হেক্টর। এছাড়া বর্গাদারদের সংখ্যা ছিল ১,০৬,০২৪ জন এবং বর্গাজনিত প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ২৪,৫১৭ হেক্টর। [২৯] পরবর্তীকালে জমি বন্টনের পরিমাণ আরও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও তার সাথে পাট্টা প্রাপকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। যেমন ---- ২০০২ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৩,০৭৯ হেক্টর খাস জমি ১,৫৫,৫৫৯ জনের মধ্যে বন্টিত হয়। এছাড়া ৬৬,৯৯০.৮৪ একর জমি ১,১৬,৬৮৪ জন ভাগচাষির নামে রেকর্ড হয়। [৩০]

অর্থাৎ সামগ্রিক আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে খরাপ্রবন বাঁকুড়ায় স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ কোম্পানির শাসনে কৃষি ও কৃষক যেভাবে অবহেলিত হয়েছিল তাতে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনেরও নিশ্চয়তা ছিল না। কৃষক ছিল করভারে জর্জরিত। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য স্থানের মতো বাঁকুড়াতেও কৃষি ও কৃষকের উন্নতির সার্বিক চেষ্টা করা হয়। ক্ষমতাসীন সরকারগুলির চেষ্টায় কৃষির উন্নয়নের সুফল বাঁকুড়ার কৃষক ভোগ করার সুযোগ পায়। আর এই সুফল বর্তমানের বাঁকুড়াতে সর্বত্রই চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মতো বাঁকুড়াতেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮০ - ৮১ সালে এখানে মোট কৃষি উৎপাদনের সূচক ছিল ১১৫.১৪ এবং ১৯৯৭ - ৯৮ সালে তা হয় ২৩৯.১৭। [৩১] বর্ধমান জেলায় ১৯৯৭ - ৯৮ সালে হেক্টর পিছু খাদ্য শস্যের উৎপাদন ছিল ২৯১৬ কেজি এবং বাঁকুড়া জেলায় ছিল ২৭০৪ কেজি। [৩২] এই পরিসংখ্যান থেকেই বাঁকুড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির হার সম্পর্কে জানা যায়। ২০০০-২০০১ সালে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয়, সেই খাদ্যশস্যের বেশিরভাগ অংশই যায় প্রান্তিক কৃষকদের ঘরে। যার ফলে খাদ্য সংকটের নিরসন হয়। [৩৩] অর্থাৎ এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে ধীরে ধীরে প্রান্তিক মানুষদেরও খাদ্যাভাবও কমে এসেছে। যা বাঁকুড়ার কৃষির উন্নতির পরিচায়ক ।এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষিজ ফসলে বৈচিত্র্য এসেছে। বাঁকুড়ার রুক্ষ, শুষ্ক ডাঙ্গা জমিতে আম্রপালি আম, আঙুর, নাসপাতি, মোসাম্বি লেবু উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ফসলে বৈচিত্র্য আসায় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতেও রক্ত সঞ্চালন হয়েছে। সার্বিক ভাবে গ্রামোন্নয়ন শুরু হয়েছে। আর গ্রামোন্নয়নের ফলে গ্রামের সামাজিক চরিত্র বদল হয়েছে। দেখা যায় আশির দশকে কাঁচা রাস্তার তুলনায় পাকা রাস্তার অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং নব্বইয়ের দশকে ঐ রাস্তাগুলির গুনগত মান অনেক উন্নত হয়। [৩৪] গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতেই বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা পুকুর, টিউবওয়েল, কুয়ো খননের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জল কষ্ট দূর হয়েছে। সর্বোপরি সমস্ত কিছুর ফলে কৃষক জীবনে সচ্ছলতা বেড়েছে। ঋণ ব্যবস্থা, বীমা ব্যবস্থার ফলে কৃষককে নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। কৃষিজ যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি মেলায় বর্তমানে প্রায় প্রতিটি কৃষকই পাম্পসেট, স্প্রেয়ার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সমর্থ হয়েছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষেতমজুরের ছেলে মেয়েরাও শিক্ষার

আলোয় আলোকিত হয়ে উন্নত জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়াতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে এবং তার সাথে কৃষক ও গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনও উন্নততর হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. লীলাময় মুখোপাধ্যায়, *জেলার নাম বাঁকুড়া,* বসুমিত্রা সিং, প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া, ২০১৯, পৃ. - ২০।

২. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪০৯।

৩. অমলেন্দু মণ্ডল (সম্পাদক), *বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি,* বাঁকুড়া, ১৩ই এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ১৭।

৪. *পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৯, পৃ. ১৬।

৫. রূপেন চট্টোপাধ্যায়, নীহার হাজরা, গৌরপদ সেন, *বাঁকুড়া পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড),* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২২শে জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২৩।

৬. রঞ্জন কুমার মণ্ডল, *বাঁকুড়া জেলার কৃষি অর্থনীতি (১৮৮৫ - ১৯৫০) : জলসেচ, শ্রমিক ও মূলধন* (গবেষণাপত্র), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১৪৬, ১৪৭।

৭. https://bn.m.wikipedia.org

৮. রঞ্জন কুমার মণ্ডল, ঐ, পৃ. ১২৭।

৯. রঞ্জন কুমার মণ্ডল, ঐ, পৃ. ১২০।

১০. অচিন্ত্য জানা, *সমবায় আন্দোলনে বাঁকুড়া,* রাঢ় একাদেমি, বাঁকুড়া, জুন ১৯৯৯, পৃ. ৫৬।

১১. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. ৩২।

১২. শ্রী অনুকূল চন্দ্র সেন, *বাঁকুড়া পরিক্রমা,* সেন বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৩১।

১৩. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. ৬৫।

১৪. হিমাংশু ঘোষ, *পঞ্চায়েত পরিক্রমা : বাঁকুড়া,* বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট, বাঁকুড়া, ১লা বৈশাখ, ১৪০২, পৃ. ৪৭৮।

১৫. শ্রী অনুকূল চন্দ্র সেন, ঐ, পৃ. ২৩২।

১৬. শ্রী অনুকূল চন্দ্র সেন, ঐ, পৃ. ২৩২।

১৭. সৌমেন দে, 'কংসাবতী:একটি আন্দোলনের নাম', গৌতম দে (সম্পাদক), *পশ্চিমরাঢ় গবেষণা ষান্মাসিক,*পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৬।

১৮. সুব্রত পণ্ডিত, ঐ, পৃ. ১০২।

১৯. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স,*কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ২৪৫।

২০. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ২৪৫।

২১. টোডরমল, *ভূমি রাজস্ব ও জরিপ,*অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২, পৃ. ২১১।

২২. টোডরমল, ঐ, পৃ. ২৩৬, ২৩৯, ২৪১ ।

২৩. হিমাংশু ঘোষ, ঐ, পৃ. ৪৭৯।

২৪. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. ঙ।

২৫. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. ঙ, চ।

২৬. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. ৩৫।

২৭. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. চ।

২৮. rupantarblog. blogspot. com.

২৯. অচিন্ত্য জানা, ঐ, পৃ. গ, ঘ।

৩০. অচিন্ত্য রায়, *কৃষি ও সংস্কৃতি,* শিল্পাশা, বাঁকুড়া, ২১ শে চৈত্র ১৪১২, পৃ. ৭২।

৩১. *পশ্চিমবঙ্গ,* বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা, ঐ, পৃ. ৩১৮।

৩২. *পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা,* ঐ পৃ. ৩১৮।

৩৩. অচিন্ত্য রায়, ঐ, পৃ. ৪৭।

৩৪. *পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা,*ঐ পৃ. ৩১৮।